নারীর প্রতি সহিংসতা, অসহায় নারী ও সরকারের পদক্ষেপ

নিয়াজ আহম্মেদ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির আদলে নারী উন্নয়ন ও সমাজে তাদের বসবাস সুখকর করার জন্যে কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বডির প্রতি থাকে রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন। এসব সংস্থা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সনদ ও বিধি-বিধানের প্রতি কখনো পূর্ণ কখনো-বা আংশিক সমর্থন দিয়ে রাষ্ট্রসমূহ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। অঙ্গীকারকৃত বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজস্ব আইন, দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির আদলে পরিবর্তনও করে নেয়। তখন বিষয়টি একটি সর্বজনীন বিষয়ে পরিণত হয়।

একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অধিক জনবহুল মুসলিমপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রয়েছে নিজস্ব আইন এবং তা বাস্তবায়নের নিজস্ব ম্যাকানিজম। অতীতের যৌতুক নিরোধ কিংবা বাল্যবিবাহ আইনের ধারাবাহিকতায় সময়ের প্রয়োজনে প্রতিটি সরকারই নারী অধিকার ও উন্নয়নে বহুবিধ আইন প্রণয়ন করেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক আইন ও নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১০, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০ এবং সর্বশেষ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১২। এ আইন ও নীতিগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে নারীর প্রতি সহিংস আচরণ সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসার সম্ভাবনা।

নারীর প্রতি সাম্প্রতিক সময়ের সহিংস আচরণের মাত্রা অতীতের সকল রেকর্ডকে হার মানিয়েছে। কেবল যৌতুকের জন্য মারধর নয় বরং ধর্ষণের মতো সহিংস আচরণের মাত্রাটিও এখন প্রকট। অতি সম্প্রতি মানিকগঞ্জের এক গৃহবধূ ধর্ষণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যে চলন্ত বাস থেকে ঝাঁপ দিলে তিনি বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যান। তার স্বামীও এ ঘটনায় মারাত্মক আহত হন। আমরা লক্ষ করেছি, কাপাসিয়ায় গৃহপরিচারিকার ওপর পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা। বিশেষ করে বর্তমানে আমরা খুন ও ধর্ষণের মতো জঘন্য সহিংসতা বেশি পরিমাণে লক্ষ করছি। অথচ দুই দশক পূর্বেও সহিংস আচরণের এ ধরনটি এতটা বেশি দৃশ্যমান ছিল না। দিনকে দিন এ ধরনের সহিংসতা বেড়েই চলেছে। বাস্তবতা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে এ সংক্রান্ত আইনের সংশোধন এবং নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করা হলেও খুনি ও ধর্ষকরা যেন কাউকেই পরোয়া করছে না। এখন সময় এসেছে নতুনভাবে চিন্তা করার এবং এ সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের অ্যাপ্রোচগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আনার।

নারীর প্রতি সহিংস আচরণের মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ, যার মূল কর্ণধার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এর সঙ্গে যুক্ত আছে সরকারের আরো নয়টি মন্ত্রণালয়; যথা, আইন ও বিচার, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, সমাজকল্যাণ, স্বরাষ্ট্র, যুব ও

ক্রীড়া, ধর্ম, শিক্ষা ও তথ্য মন্ত্রণালয়। এসব মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ডেনমার্ক সরকারের সাথে যৌথভাবে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। একটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংস আচরণের ঘটনা কমানো সম্ভব নয় বিধায় সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। সহিংস আচরণের শিকার নারীকে অতি দ্রুত সেবা প্রদান করা জরুরি। নইলে সংকট ভয়াবহতায় রূপ নিতে পারে। সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে 'ক্রাইসিস ইন্টারভেনশন মডেল' অ্যাপ্রোচের আলোকে ধর্ষণের মতো আচরণকে বিবেচনায় আনা হয়। এ প্রেক্ষাপটে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার-এর অধীনে আটটি বিভাগীয় শহর এবং একটি জেলা শহরে নারীর প্রতি সহিংস আচরণের বিষয়গুলো মোকাবেলা করা হচ্ছে। এখন নির্যাতিত ও ধর্ষণের শিকার নারীরা এখান থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সেবা পেতে পারেন।

সহিংস আচরণের আরেকটি ধরন নিজের ঔরসজাত সন্তানকে অস্বীকার করা। এখানে সাধারণত রেজিস্ট্রিবিহীন বিয়ে কিংবা বিয়ে-বহির্ভূত সন্তানকে অস্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারীকে হত্যা করার প্রবণতাও কম নয়। বর্তমানে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে সন্তানের বাবা-মা নির্বাচন করা সম্ভব হয়। চলমান অ্যাপ্রোচে এ ব্যবস্থা রয়েছে।

সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল নামে একটি সেল রয়েছে, যেখানে নির্যাতনের শিকার নারীরা সেবা পেতে পারেন। সহিংসতা একটি অবিরাম প্রক্রিয়া। কখনো কখনো দীর্ঘ সময়ব্যাপী সহিংসতার ফলাফল ভোগ করতে হয়। কেউ কেউ এ কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যান বা ভেঙে পড়েন। আবার কেউ কেউ মানসিক রোগীও হয়ে যেতে পারেন। এ লক্ষে ঢাকায় একটি ট্রমা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে দীর্ঘ সময় ধরে সহিংস আচরণের শিকার বিপর্যস্ত নারীদের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

এ ধরনের নির্যাতনের শিকারদের সকল সময়ের জন্য পরামর্শ প্রয়োজন। সহিংসতার মাত্রা ছোট কিংবা বড়ো যাই হোক না কেন, নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শদানের মাধ্যমে তা থেকে উত্তরণ সম্ভব হতে পারে। নিয়মিত পরামর্শদানে নিজেদের মধ্যে সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি পায়। বাড়ে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে নিজেকে ধাপ খাইয়ে চলতে পারার অদম্য সাহস। পাশাশাশি পুনর্বাসনের বিষয়টিও অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। এ প্রক্ষাপটে পরামর্শদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রয়েছে নির্যাতিত ও সহিংস আচরণের শিকার নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

নিত্য-নতুন সহিংস আচরণ মোকাবেলায় যেমন প্রয়োজন কঠোর আইন, তেমনি এ ধরনের আচরণের শিকার নারীদের মর্যাদা সহকারে সমাজে বসবাসের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। সহিংসতার শিকার নারী আইনের আশ্রয় নিলে প্রায়ই তাদের ওপর খড়্গ নেমে আসে। যদিও সর্বশেষ আইনে সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে, তবু বাস্তবতা ভিন্ন। কেননা আইন প্রয়োগকারী এজেন্টগুলো আমাদের দেশে এখনো নিরপেক্ষ এবং কার্যকর নয় বলে সহিংস আচরণের শিকার হবার পর স্বামীর ঘরে ফিরে গেলেও আবার নারীদের সহিংস আচরণের শিকার হতে হয়। সুতরাং সহিংস আচরণের ঘটনা যাতে কম সংঘটিত হয়, সেদিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া জরুরি। সরকারের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমগুলো এমন হওয়া উচিত, যাতে সহিংস আচরণের মাত্রা ক্রমশ কমে আসে।

'মেয়েরা যেন তুলশী পাতা, কেউ জানে না পড়বে কোথা, প্রসাদে কি ব্যাঙের ছাতা'— মেয়েদের সম্পর্কে সমাজের এমন পুরানো ও নোংরা ধারণা বর্তমান সময়ে মেয়েদের অবস্থানের সাথে মিলে না। মেয়েরা এখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও যাবে। তাদের ভবিষ্যৎ বলা এখন অবান্তর নয়। নারীর প্রতি

সহিংসতা, যৌতুক, ইভটিজিং, অ্যাসিড নিক্ষেপের মতো ভয়াবহ ইস্যুগুলোর মধ্যে সহজে হারিয়ে যায় আমাদের সমাজের অসহায়, সহায়সম্বলহীন নারীদের কথা, যাদের আমি বিশেষ নারীগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করতে চাই। নারীরা আজ সম্মানজনক পদে চাকুরি করছেন, সমাজে তাদের অবস্থান ও সম্মান বাড়ছে। একাংশ নারীর ভালো খাওয়া-পরারও সমস্যা নেই। তবে এদেরও পরিবারে রয়েছে নানারকম দ্বন্দ্ব-সংঘাত। আমাদের সমাজে এখনো সম্মানজনক কাজে অর্থ উপার্জনের সাথে যুক্ত দম্পতির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও এদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। নারী শিক্ষার হার বাড়া এবং চাকুরির বাজারে বড়ো কোনো বৈষম্যের শিকার না হওয়ায় এমনটি ঘটছে বলে ধারণা। তবে কেবল স্বামীর আয়ে পরিবার চলছে এমন পরিবারের সংখ্যাই আমাদের সমাজে বেশি। এদের নিয়েও ততটা বিপদ নেই। হয়ত মোটামুটি খেয়ে-পরে তারা টিকে থাকতে পারেন। বিপদ মূলত সেসব অসহায় নারীর, যাদের ভরণপোষণের কার্যত কেউ নেই। তারা নিতান্তই অসহায়।

জনসংখ্যা কাঠামোর বিচারে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, স্বামীর বহুবিবাহের কারণে ভরণপোষণে সমস্যাগ্রস্ত, দীর্ঘদিন ধরে পৃথক বসবাসকারী, তালাকপ্রাপ্ত এবং স্বামী থাকা সত্ত্বেও কোনো কারণে ভরণপোষণ না পাওয়া নারীর সংখ্যা এদেশে কম নয়। এদের সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া কঠিন। তবে পথে-ঘাটে কাজের খোঁজে এক জায়গায় দলবদ্ধ হয়ে বসে থাকা এবং বাসাবাড়িতে কাজের খোঁজে ফেরাদের দেখে এটি অনুমান করা যায় যে, এরা সংখ্যায় কম নয়। এদের বয়স কাঠামো সুনির্দিষ্ট নয়। কারো বয়স সবেমাত্র পঁচিশের কোটা অতিক্রম করেছে, কেউ-বা পঞ্চাশ কিংবা তদূর্ধ্ব। বয়সের কারণে কেউ কেউ ন্যুজ। আক্ষরিক অর্থে যাকে আমরা পরিবার বলি, এদের বেশির ভাগই সে ধরনের সুবিধার মধ্যে নেই। সমাজের নিম্ন অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থাকা এ মানুষগুলোর প্রতিদিনকার জীবন কাটে অনিশ্চয়তায়। এদের মধ্যে যাদের বয়স তুলনামূলকভাবে কম তাদের বিভিন্ন হয়রানির শিকার হতে হয়। একজন বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্ত কিংবা স্বামী পরিত্যক্ত নারীর ভরণপোষণই যেখানে প্রধান সমস্যা, সেখানে আর দশটি সাধারণ নারীর মতো স্বাভাবিক জীবনের অন্যান্য উপকরণের কথা ভাবা অবান্তব।

জীবিকা অর্জনের জন্য মৌলিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কোনো সুযোগ না থাকা এবং যদি থাকেও সেক্ষেত্রে সেই সুযোগের আওতায় না আসার কারণে প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয় এ ধরনের নারীদের। কোনো কোনো বড়ো শহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে সকালবেলা ঝুড়ি ও কোদাল নিয়ে বিভিন্ন বয়সের নারীরা অপেক্ষায় থাকেন, নির্মাণ কাজের জোগালি হিসেবে তাদের কেউ নিয়ে যাবে এ আশায়।

এরকম চিত্র গ্রামে দেখা না যাওয়ার কারণ হলো, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সীমিত বলে নিম্নবিত্ত কর্মসক্ষম নারীরা বেঁচে থাকার প্রয়োজনে শহরে চলে আসেন। সকালের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এরা অপেক্ষায় থাকেন। কেউ তাদের কাজে নেবার জন্য আহ্বান করবে সে আশায় এরা ফুটপাতে হাঁটা মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বেলা বাড়লে কাজ না পাওয়া নারীরা ঝুড়ি ও কোদালসহ ভগ্নমনে নিজ আবাসস্থলে চলে যান। এদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, মাসে কখনো পনেরো দিন, আবার কখনো-বা তারও কম দিন কাজ জোটে তাদের। এর মাধ্যমে যে টাকা তারা পান, তা দিয়েই তাদের দিনাতিপাত করতে হয়। এদের কেউ কেউ একা, কারো-বা কর্মহীন স্বামী ও সন্তান নিয়ে সংসার। প্রতিদিন সকালবেলার এ চিত্র দেখলে কারো মন খারাপ না হওয়ার উপায় নেই। কর্মস্থলে তাদের ছোট বাচ্চাদের উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করতে দেখা যায়, কেউ-বা পাশের বাসায় কারো কাছে বাচ্চাদের রেখে আসেন। সবচেয়ে করুণ ও বেদনাদায়ক সময়টি হলো যখন কাজ না পেয়ে ভগ্ন মনোরথ হয়ে তাদের বাড়ি ফিরতে হয়। এ দৃশ্যের পাশেই আমরা দেখি বড়ো বড়ো

অট্টালিকা, দামি দামি গাড়ি। দেখি ও শুনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও অর্থ লুটপাট করার দৃশ্য। জ্যামিতিক হারে সম্পদ বাড়ার মহোৎসব।

নারীর মানবাধিকারের সামগ্রিক ব্যাখ্যায় কেবল সহিংসতা মোকাবেলা করা, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা কিংবা ফতোয়ার মতো জঘন্য পরিস্থিতিকে রোধ করার পাশাপাশি একান্ত মৌলিক প্রয়োজন যেমন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া সর্বকালের ও সর্বসময়ের দাবি। বেঁচে থাকার জন্য কাজের সন্ধানরত সমাজের অসহায় নারীকুলের জন্য নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের হস্ত প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজন বেশি। সরকারি পর্যায়ে সামাজিক বেষ্টনীর আওতা এতটাই সীমিত এবং স্বল্প আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্ত যে, সেখানে ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ সম্ভব নয়। তাছাড়া এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার ক্ষেত্রে রয়েছে নানা হিসাব-নিকাশ। রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় থাকলে সুযোগটি গ্রহণ করা সহজ হয়। বড়ো কথা হলো, সুযোগ অপর্যাপ্ত। গ্রামে-গঞ্জে কিংবা শহরে ছড়িয়ে থাকা এনজিও ও তাদের দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এদের জন্য সুফল বয়ে আনছে না, বরং এরা ঋণের জালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলছেন। এটি হয়ত সত্য যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বাড়ানোর অর্থ হলো মানুষকে কর্মবিমুখ করা এবং নির্ভরশীলতার পরিমাণ বাড়ানো। তবু এটা ততদিন পর্যন্ত প্রয়োজন, যতদিন আমরা সবার জন্য কাজের সুযোগ উন্মুক্ত করতে না পারছি। সবাইকে কোনো না কোনো কাজের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া কি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়? বিকল্প হিসেবে ইসলাম ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাত ব্যবস্থার পরিপূর্ণ ব্যবহারের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। সকলে সঠিকভাবে যাকাত দিলে এ ধরনের নারীদের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সহজ হতো।

ধর্মীয় সংগঠনগুলোর অনেক নেতা নারীর বাড়ির বাইরে বিচরণ ও শিক্ষা গ্রহণের ঘোর বিরোধী। তাদের বিরোধিতা নারীর কর্মসংস্থানের প্রতিও। কিন্তু যে নারীর ভরণপোষণের জন্য কেউ নেই, তার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটি কী? এটি তো ঠিক যে, কোনো কোনো নারীর ভরণপোষণের জন্য কেউই থাকে না। ভারতে মুসলমান তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য স্বামী কর্তৃক ভরণপোষণের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে সে ব্যবস্থাও নেই। সময় এসেছে বিশেষ করে নিজে ভরণপোষণে অক্ষম অসহায় নারীদের জন্য রাষ্ট্রীয়, বেসরকারি ও সমাজের বিত্তবান মানুষের দায়িত্বের দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়ার। তাদের ন্যূনতম বেঁচে থাকার সুযোগটুকু করে দেওয়ার চেষ্টাটি কি আমরা করতে পারি না?

ড. নিয়াজ আহম্মেদ অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। neazahmed_2002@yahoo.com